Android Coding Bd

দ্বিতীয় অধ্যায়
অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াস ও উপমহাদেশের বিভক্তি, ১৯৪৭

বাংলায় দু'টি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করেছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগে যে রাজা শাসন করেছেন তার ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু অন্য সম্প্রদায়কে এমন উৎপীড়ন করা হয়নি যা প্রবল সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে পারে।

ভারতবর্ষ বিভক্ত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষায়। সেখানেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বের আগে ধর্ম নিয়ে প্রবল বিরোধ বা প্রবল সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়নি।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ব্রিটিশ শাসন কর্তারা সাম্প্রদায়িকতাকে শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন এবং তখনই আজ যে সাম্প্রদায়িকতা দেখছি তার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়। ব্রিটিশ সিভিলিয়ান আলফ্রেড লায়াল লিখেছিলেন– ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠি হলো ধর্ম। শুধু তাই নয়। ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা উচিত। অর্থাৎ ভারতের লোক রক্ত বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং এই বিভক্তি যা ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ তা অটুট রাখাই শ্রেয়।

উনিশ শতকে মুসলমানরা রাজ ভাষা না শিখে ভুল করেছিল। ফলে, অনুন্নত একটি সম্প্রদায়ে তারা পরিণত হয়েছিল। হিন্দুরা ইংরেজি শিখে সম্প্রদায়গতভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ, সেই সময় ইংরেজি শিক্ষা ছিল বিত্ত ও মর্যাদার চাবিকাঠি। এই অসম উন্নয়ন দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রয়োজনমত একেক সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দিতেন বা বিভক্তির সৃষ্টি করতেন যাতে শাসনের সুবিধা হয়।

কংগ্রেসের পর এ কারণেই রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের উদ্ভব হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা টু-নেশন থিওরি ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশ শতকে একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাড়তে থাকে, সাম্প্রদায়িকতা মানস জগত আচ্ছন্ন করতে থাকে, ধর্ম ব্যবহৃত হতে থাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে। অন্যদিকে পুরনো সমন্বয়বাদী ধারা বা সিনক্রেস্টিক ধারা অন্তত বাংলার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

ঔপনিবেশিক আমলে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার সৃষ্টি সবার জানা এবং এর কারণও যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশ্রয় তাও জানা। হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণজাত সমস্যা ও শ্রেণী দ্বন্দ্বও এর কারণ, বিশ শতকে লেখা বিভিন্ন আত্মজীবনীতেও যার উল্লেখ আছে। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন লিখেছিলেন, এক গরীব মুসলমান, এক সম্পন্ন হিন্দুর বাড়ির উঠোনে চলে এলে বাড়ির কর্তা জাত গেল বলে তাকে জুতা পেটা করে। গরীব মানুষটিই তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কর্তা,

Android Coding Bd

ওহান দিয়া তো আপনাগো কুকুরডাও যায়, ভাতের [illegible] তো এট্টা মানুষ কর্তা।" আর ছিল "জমিদারের জুলুম। শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়ে যেখানে বাস, সেখানে জমিদারের মধ্যে হিন্দু জমিদাররাই সংখ্যায় বেশী ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমান জমিদারও ছিল। কিন্তু চাষীদের শিক্ষা দিতে উভয়েরই ছিল একই পদ্ধতি। আর স্বভাবতই মুসলমান চাষীরাই ছিল সংখ্যায় বেশী।"

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অনেকের মতে, এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব যতোটা ছিল হিন্দু-মুসলিম এলিটদের মধ্যে ততটা গরীব বাঙালির নয়। এ বিষয়টি গত একশো বছরে কলকাতাকেন্দ্রিক ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচারের কারণে উঠে আসেনি। তা'হলো এ অঞ্চলের বাঙালি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা জোরালোভাবে করেনি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন চাষী আর হিন্দু চাষীদের ৯০% ছিলেন নমশূদ্র। এরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা কেন করবেন? বরং এরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কাজ করেছেন। বাখরগঞ্জে নমশূদ্রদের এক সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল, ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অপছন্দ এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদের কারণে বিরাট এই নমশূদ্র সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। অথচ মুসলমান ও তাঁরাই পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং এই সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাদের সঙ্গে কাজ করার বরং তারা হাত মিলিয়ে কাজ করবেন তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে। ব্রাহ্ম গিরিশ চন্দ্র সেন লিখেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ তিনি সমর্থন করেন কারণ, এর ফলে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের উন্নতি হবে এবং এ কথা ভেবে তার 'আহলাদ হইয়াছে।' ১৯০৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হলে নওয়াব আলী চৌধুরী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "পুরনো প্রশাসনে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা অববাহিকা ছিল অবহেলিত। বর্তমানে নতুন প্রশাসন চালু হওয়ায় পূর্ব বঙ্গ ফিরে পেয়েছে নতুন প্রাণ। কলকাতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় যেন সুন্দর জীবন ফিরে এসেছে। ...যদি পূর্ববঙ্গে ১০০ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সম সংখ্যক সাব-ডেপুটি মুনসেফ এবং সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন, তা'হলে তাঁরা হবেন এ দেশের মাটির হিন্দু মুসলমান ছেলে মেয়েরা।" তিনি এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ডে যে সমস্যা, পূর্ববঙ্গ কলকাতার সমস্যাটিকেও সেভাবে দেখেছেন।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম লীগের উত্থান ও বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম লীগের উদ্ভব ঢাকায় কিন্তু অচিরেই এর কর্তৃত্ব চলে যায় উত্তর ভারতে। ভারতীয় এলিটরা এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪৭ এর আগে ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ সামাজিক সংগঠিত সমাবেশ ঘটানোর জন্য ইতিহাসের সূত্রগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তারা জোর দিয়েছেন মুসলমান নৃপতিদের ওপর যারা ছিলেন শৌর্যে বীর্যে তাদের ভাষায় অতুলনীয় এবং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন ভারতীয় মুসলমানরা তাদেরই বংশধর। ইসলামী শাসনের যুগ স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ ও হিন্দুদের [কংগ্রেস] চক্রান্তে আজ তারা হীনবস্থায়। এই হীনবস্থা থাকবে না যদি মুসলমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয়। ইতিহাসের এই ব্যবস্থা মুসলমান তরুণদের সংগঠনে ভূমিকা রেখেছে এবং 'পাকিস্তান মানসিকতা' তৈরি করেছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে পাকিস্তান : মুসলমান।

Android Coding Bd

ভারত: হিন্দু। এই মানসিকতা গঠন খুবই তীব্র এবং শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের পক্ষে তা কাটিয়ে ওঠা দুরূহ। এটা ঠিক পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের এই প্রচার কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এবং এটি মুসলমান মানস বা মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়। তবে, ১৯৭১ এর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা কৃষিজীবী তাদের এই মিথ প্রভাবিত করেনি যতটা করেছে অর্থনৈতিক বঞ্চনা। পাকিস্তান তাদের মনে হয়েছিল বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু, ভারত বিভাগের দায় বর্তেছে মুসলিম লীগ ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের ওপর।

ভারত ভাগের পর ঐতিহাসিকরা এই তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন বা যে তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বা আছে তা'হলো ভারত বিভাজনের জন্য মুসলমান বা মুসলিম লীগই দায়ী। এর সমালোচনা যে খানিকটা হয়নি তা' নয়। তবে, দল হিসেবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসীরা এই তত্ত্ব বেশি প্রচার করেছেন যাতে ভারত বিভাগের দায়িত্ব তাদের ওপর না পড়ে। বাংলা বিভাগের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে জয়া চ্যাটার্জী দেখিয়েছিলেন যে, এর সবটাই সত্য নয়। তিনি লিখেছেন, ১৯৮০ সালে যখন তিনি গবেষণা শুরু করেন, "তখন একটা সাধারণ ও অনুকূল ধারণা প্রচলিত যে ভারত বাংলার বিভক্তি মুসলমানদের কাজ। হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির অখণ্ডতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে কোনো কিছুই করে নি। ঐ সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণায় প্রকাশ পায় যে, স্বাভাবিক ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল এবং বহুত্ববাদী তাই হিন্দুত্বে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নেই।... ঐ গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোকদের (elites) ক্রম-ক্ষুয়িষ্ণু ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও মর্যাদা হুমকীর সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে। সত্যিকার অর্থে ঐ কূট কৌশলকে একমাত্র সাম্প্রদায়িক হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়।" গত শতকের শেষ দশক থেকে ভারতে আবার হিন্দুত্ববাদের বা রাজনীতির প্রবল প্রতাপ, তাতে, জয়া জানাচ্ছেন, তাঁর যুক্তিগুলিই "কত বিতর্কিত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।"

পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাদের একটা বড় অংশ ছিলেন মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত। কিন্তু, কৃষক বা নমশূদ্ররা সেভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন কী না সন্দেহ। অর্থনৈতিক বঞ্চনাই ছিল প্রধান। তাই ১৯৪৭ এর পর দেখি, মুসলিম তরুণরা মুসলিম লীগ আরোপিত ইতিহাস ঝেড়ে ফেলছে এবং সেই অর্থনৈতিক বঞ্চনাই মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্তির সেটিই মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরাজিত হয় দ্বিজাতি তত্ত্ব এই পূর্ববঙ্গেই, 'অতীতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়।

যারা বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ছিলেন মুসলিম লীগের তরুণ তুর্কী। তা'হলে এটি সম্ভব হলো কীভাবে? এ বিষয়ে হারুন-অর-রশিদ তাঁর *বাংলা বিভাগ* ও

Android Coding Bd

অভিন্ন বাংলা প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বাঙালি মুসলিম লীগের কাছে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, কৃষ্টি, ঐতিহ্যে বিভক্ত মুসলমানদেরকে তাদের সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার একটি 'স্ট্রাটেজি' মাত্র। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ভারতে দ্বিজাতি নয়, বহুজাতি সত্তা রয়েছে।...বাংলার এই নেতৃত্বের নিকট 'পাকিস্তান' ছিল লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি আন্দোলনের নাম, একটি একক রাষ্ট্রের রূপরেখা নয়। প্রাক ১৯৪৭ সালে, এ ভূখণ্ডে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠা তার কাছে মনে হয়েছে দুরূহ ছিল। এবং "বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনের এ পর্বে এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু-আধিপত্যের ভীতি বাঙালি মুসলমানের মন থেকে কেটে গেলে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্বটি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা এবার পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের সাধারণ রাজনৈতিক শত্রু–পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন, শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে।"

উপর্যুক্ত বিবরণের উদ্দেশ্যে একটি। তা'হলো প্রথাসিদ্ধ ভাবে আমরা এ ভূখণ্ডের জনসমষ্টিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করে (হিন্দু ও মুসলমান) দেখাবার চেষ্টা করি যে, দু'সম্প্রদায়ের মানসভূবন আলাদা এবং ধর্ম সেখানে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে সম্প্রদায়গত বিভাজনে। এবং এই মানসগঠন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর চেয়ে সমন্বয়ধর্মীর যে ব্যাপারটি ছিল উনিশ শতক পর্যন্ত সেটিই ছিল ভালো। আসলে চিন্তাটা করা হয়েছে এই বোধ থেকে যে, প্যাগানিজমই উত্তম। তা লৌকিকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এতে ধর্ম বোধের সমস্যা কম। এবং হিন্দু ধর্মকে তার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলামকে বিচার করা হয়েছে যা ফ্যালাসী মাত্র। কিন্তু, আলোচনায় দেখা যায় দু'টি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় হলেও এরা প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পাশাপাশিই অবস্থান করেছে। ধর্মবোধ তাদের দু'টি বিপরীতমুখী অবস্থান সৃষ্টি করেনি অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে। বহিরাগত সংস্কারকরা, বিশেষ করে মুসলমান ওহাবী সংস্কারকরা ওপর থেকে ইসলামের তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও অন্তিমে তা প্রভাব ফেলতে পারে নি। হিন্দু সংস্কারকরা মূলতঃ নিজেদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয়টাই প্রাধান্য পেয়েছে বা এই পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন সময় এলিট বা রাষ্ট্র নষ্ট করতে চাইলেও পারেনি। এই বোধের কারণেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বদলে বাঙালিত্বের বিভিন্ন উপাদান রক্ষার ব্যাপারে যৌথ লড়াই হয়েছে। এই উপাদানগুলিকে বরং সমন্বয় ধর্মীয় উপাদান বলা যেতে পারে। আবার এই বোধকে অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পারেন। তবে ধর্ম সহিষ্ণুতা বলাই বোধ হয় শ্রেয়। বাঙালির জাতি রাষ্ট্র গঠনে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, পুরনো আলোচনার সূত্র ধরে বলতে পারি হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাসের ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ড. হারুন-অর-রশিদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির [illegible] মুসলমান সম্মিলিত প্রয়াসে বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬), খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২), সি.আর দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩), ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা-আন্দোলন ও কৃষক-প্রজাপার্টি (১৯৩৬), বাংলার হিন্দু-নেতৃবৃন্দদের অন্তর্ভুক্ত করে এ কে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) গঠন, ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের সুপারিশ। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন উত্তর কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস এবং দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণ শঙ্কর রায়ের 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনা তার সাক্ষ্য।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অন্তিমে দ্বিজাতি তত্ত্ব আর কার্যকর থাকেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর প্রমাণ।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করে। এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে এগিয়ে নেন। জিন্নাহর এক বক্তব্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

> 'We maintain and hold that Muslims and Hindus are two major nations by any definition or text of a nation. We are a nation of a hundred million and, what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilisation, language and literature, art and architecture...customs...history and traditions. aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life.

অর্থাৎ, "আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, জাতিতত্ত্বের যে-কোনো সংজ্ঞা বিচারে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি প্রধান ভিন্ন জাতি। ভারতের দশ কোটি মুসলমান জাতি রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এক ও অভিন্ন জীবন-পদ্ধতি।' [অনুবাদ : হারুন-অর-রশিদ]

বিশ শতকের ত্রিশ চল্লিশ দশকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল অবাঙালিদের হাতে।

ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশিম সর্বভারতীয় নেতা হলেও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ কখনও তাদের হাই কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত করেননি। বাংলার স্থানীয় নেতা হিসেবেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। তবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের উপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। 'লাহোর প্রস্তাব তার প্রমাণ।

১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন হয়। সেখানে এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব আনেন যা পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। প্রস্তাবটি ছিল এরকম–

> 'Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic

Android Coding Bd

Android Coding Bd

principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India should be grouped to constitue 'Independent States' in which constituent units shall be autonomous and sovereign....This Session further authorise the working committee to frame a scheme of constitution....providing for the assumption finally by the respective regions of all power such as defense, external affairs, communications, customs and such other matters as may be necessary.

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে–

"প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।

২. এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে-সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ-সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।

৫. মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, রাজস্ব এবং অন্যান্য সকল ক্ষমতা আপন কর্তৃত্বাধীনে তুলে নিতে সক্ষম হয়।

লাহোর-প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়ে এক সময় বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও, আজ এটা স্বীকৃত যে, 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) দ্বারা উল্লিখিত দুটি অঞ্চলে বস্তুত দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সবারই জানা যে, এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হক। তিনি কখনো জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। লাহোর-প্রস্তাবের কোথাও 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' উল্লেখ নেই। এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটিরও উল্লেখ নেই, যদিও তা দ্রুত 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।"

সোহরাওয়ার্দী বা আবুল হাশেম বা ফজলুল হক এই দ্বিজাতি তত্ত্ব মানতে পারেননি দেখে অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। কারণ, তাদের মনে হয়েছিল তারা লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ হাইকমান্ড তাদের এই চিন্তা গ্রহণ করেনি। হাইকমান্ড মনে করেছে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ীই পাকিস্তান করতে হবে।

১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি

Android Coding Bd

যখন ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন তখন এখানকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ছিল ভীষণ জটিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত তখন অকেজো; দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছিল মারাত্মক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ফলে তখন এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ভারতের অখণ্ডতা আর কোনোক্রমেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। এমনি পরিস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দূর করে ভারতীয় জনগণের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ভারত বিভাগ করার উদ্দেশ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের নিকট এক পরিকল্পনা পেশ করেন। তার এই পরিকল্পনাটি 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার এক বিবৃতির মাধ্যমে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ, ১৯৪৭ ও পরিণতি

মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্বে বাংলার বিষয়টি কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের গোচরীভূত করেন। বাংলার ভবিষ্যৎ প্রশ্নে আলোচনার জন্য তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় মি. জিন্নাহ কী অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা আজো অজ্ঞাত। তবে ঐ আলোচনার পরপর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন বাংলা' পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, বাংলায় এক নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশভাগ মুসলমান ও পঞ্চাশভাগ অমুসলমান থাকবেন। এরপর প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম থাকবে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে, কী ভারতে করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে উক্ত পরিষদ। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ যুক্ত বাংলার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার গঠন কাঠামো কী ধরনের হবে সে প্রসঙ্গে হিন্দু-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের ৩০ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখের সভায় (মওলানা আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে) একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই সাবকমিটির সদস্য ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, ফজলুর রহমান ও নূরুল আমীন (আহবায়ক)।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উদ্যোগের প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের কিরণশঙ্কর রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু আশানুরূপ সাড়া দেন। ২৮ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ যুক্তবাংলা প্রশ্নে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন। সে সময় গান্ধীজি কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। যুক্তবাংলার বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ৯ মে শরৎবসু একাই, ১০ মে শরৎবসু ও আবুল হাশিম, ১১ মে সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান এবং ১২ মে সোহরাওয়ার্দী, বগুড়ার মোহামম্দ আলী এবং আবুল হাশিম

Android Coding Bd

গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজি তখন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গান্ধীজি সেদিন যা করেছিলেন তার ফলাফল ছিল শূন্য। তিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে স্বাধীন বাংলার বিষয়টি সুচতুরভাবে এড়িয়ে যান। তবে শরৎবসুকে একটি চিঠি লিখে আশ্বাস দেন যে, তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁদের প্রস্তাব পৌঁছে দেবেন।

গান্ধীজির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস না-পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৭ সালের ১২ মে একটি ছয় দফা নীতিমালা ঘোষণা করেন। নীতিমালায় উল্লেখিত হয় যে:

১. বাংলা হবে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র;
২. সংবিধান প্রণয়নের পর বাংলার আইন পরিষদ গঠিত হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে;
৩. এভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কী হবে;
৪. বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত করা হবে এবং তদস্থলে একটি সর্বদলীয় মধ্যবর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে;
৫. বাংলার পাবলিক সার্ভিস বাঙালি দ্বারা গঠিত হবে এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে;
৬. সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি অস্থায়ী গণপরিষদ গঠন করা হবে যার সদস্য সংখ্যা হবে ৬১ (৩১ জন মুসলমান এবং ৩০ জন অমুসলমান)।

শরৎবসুর এই নীতিমালার অনুরূপ আরেকটি ঘোষণা সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ১২ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসুর প্রস্তাবসমূহ নিয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সেক্রেটারি আবুল হাশিম, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (মন্ত্রী), ঢাকার ফজলুর রহমান (মন্ত্রী), বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বখশী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু। নেতৃবৃন্দ ২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাসায় এক সম্মেলনে বসে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর খসড়া রচনা করেন। এই খসড়া চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলা হবে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে তা এই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থির করবে;
২. হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা বন্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলা আইন পরিষদ গঠিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন-সংখ্যা বন্টন করা হবে; অথবা তারা যেভাবে মেনে নেন সেভাবে আসন-সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।
৩. স্বাধীন বাংলার এরূপ পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে, বা বাংলাভাগ করা

Android Coding Bd

হবে না এরূপ ঘোষণা দিলে, বাংলার বর্তমান [illegible] ভেঙে দেয়া হবে এবং সেস্থলে একটি অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। এই অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর পদ বাদে বাকি সদস্যপদ হিন্দু (তফসিলসহ) ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান বন্টন হবে। এই মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্র হবেন একজন হিন্দু।

৪. নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভা গঠন না-হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ সকল চাকুরি বাঙালিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চাকুরিতে সমানসংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান নিয়োগ করা হবে।

৫. বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হবে, সেই গণপরিষদে মোট ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। তন্মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য হবেন। বর্তমান আইনসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণই উক্ত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করবেন। গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনকালে বর্তমান আইনসভার ইউরোপীয় সদস্যগণের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

এই দলিল প্রচারিত হবার পর বাঙালি-মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ প্রকাশ্যে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। এই গ্রুপে ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ, নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ। তারা ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াত শুরু করেন। লাহোর প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে পত্রিকায় সোহরাওয়ার্দী ও হাশিম গ্রুপের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার শুরু করা হয়।

অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও 'যুক্তবাংলা' প্রশ্নে বিপাকে পড়ে। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি 'যুক্তবাংলার' বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, যেহেতু বিভাগ পরিকল্পনায় কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিশ্চিত প্রায়, অতএব যুক্তবাংলার খপ্পরে পড়া হিন্দু-নেতৃবর্গের উচিত হবে না। ফলে শেষপর্যন্ত যুক্তবাংলা পরিকল্পনার প্রতি শরৎবসু এবং কিরণশঙ্কর রায় ব্যতীত কোনো হিন্দুনেতার সমর্থন রইল না। *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রকাশ্যে যুক্তবাংলার বিরোধিতা শুরু করে। হিন্দু মহাসভা বাংলা বিভাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

এমতাবস্থায় কেবল মুসলিম লীগ আন্দোলন করে বাংলা বিভাগ রোধ করতে পারত। কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ হাই কম্যান্ড বাংলা প্রশ্নে এক নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতে থাকে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পরিকল্পনার প্রতি মৌন সমর্থন দিলেও কেন্দ্রীয় লীগের একটি গ্রুপ বাংলা লীগের মওলানা আকরাম-নাজিমউদ্দীন গ্রুপকে স্বাধীনবাংলা পরিকল্পনা বানচাল করার প্ররোচনা দিতে থাকে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এহেন নীতির কথা বুঝতে পেরে চতুর মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩ জুনের পরিকল্পনায় ঘোষণা করেন যে, কেবল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপিত হলেই তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধ করবেন, অন্যথায় নয়।

Android Coding Bd

পাকিস্তান সৃষ্টি, ১৯৪৭

১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতিতেই উপমহাদেশ বিভক্ত হয় যার প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপাতত দ্বিজাতি তত্ত্ব জয়ী হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ভৌগোলিক আকৃতি। ভারতের দু'দিকে ছিল এর সীমানা। অর্থাৎ একদিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তান অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান, মাঝখানে ১২০০ মাইলের ব্যবধান। এ ধরনের রাষ্ট্রগঠন ছিল বিরল। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মানুষজনের মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক কোন মিল ছিল না। সেই সময় কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, এ রাষ্ট্র ২৫ বছরের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে। তাঁর ভবিষ্যতবাণী সফল হয়েছিল।

এখানে অখণ্ড বাংলা কীভাবে ভাগ করা হয়েছিল এবং তার সীমানা কী ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনানুযায়ী বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের সংসদ-সদস্যগণ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পৃথক পৃথক বৈঠকে বসেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ১০৬: ৩৫ ভোটে অখণ্ড বাংলার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অপরপক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে ৫৮ : ২১ ভোটে বাংলার বিভক্তির পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। ফলে বাংলা পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। পূর্ববাংলার প্রতিনিধিবর্গ ১০৭: ৩৪ ভোটে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে এবং পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিবর্গ ৫৮: ২১ ভোটে ভারতবর্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ববাংলার যে ৩৪ জন বাংলা বিভক্তির পক্ষে এবং পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে কিন্তু ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন তারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য। এদের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় অন্যতম। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলার যে ২১ জন বাংলা বিভক্তির বিপক্ষে ভোট দেন তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই দলভুক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ. কে. ফজলুল হক ভোটাভুটিতে অংশ নেননি।

ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপন

বঙ্গভঙ্গের ভোটাভুটি সম্পন্ন হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা কলিকাতা ত্যাগ না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার সদস্য বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, কলিকাতা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কলিকাতা থেকেই পূর্ববঙ্গ শাসন করা হবে বলে তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে কলিকাতা ত্যাগ করতে হলে তার বিনিময়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু বাংলা মুসলিম লীগে তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই চরমে উঠেছে। কলিকাতা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা কলিকাতার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংগ্রাম যখন গতিশীল হচ্ছিল ঠিক সে-সময় ২৭ জুন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং

Android Coding Bd

কমিটির এক জরুরি সভায় মাত্র ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হবে।

এভাবে বাংলা বিভক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮ জুলাই (১৯৪৭) এর 'ভারত স্বাধীনতা আইনে' বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে। এভাবেই স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়।

অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণ

ক. কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড অখণ্ড বাংলাকে কখনই সমর্থন করতে পারেনি। সংগঠন দুটির বাংলা শাখায় যারা কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের অনুসারী ছিলেন তারা প্রথমদিকে অখণ্ড বাংলার দাবি সমর্থন করলেও শেষাবধি হাইকমান্ডের ভয়ে এর চরম বিরোধিতা করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মওলানা আকরম খাঁ একপর্যায়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন যে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের লাশের উপর দিয়েই বাংলা ভাগ হতে পারে-অথচ তিনিই পরবর্তীতে এর চরম বিরোধিতা করেন।

খ. দীর্ঘ ১০ বছর ধরে (১৯৩৭ থেকে) বাংলার ক্ষমতায় মুসলমান সরকার অধিষ্ঠিত থাকায় বাঙালি হিন্দু রাজনীতিবিদের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, অখণ্ড বাংলা হলে হিন্দুরা কখনও ক্ষমতা যেতে পারবে না; সুতরাং তারা অখণ্ড বাংলা সমর্থন করেননি। কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি করে।

গ. বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বসতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে পূর্ববাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বভাবতই একটা বিভক্তি যেন প্রাকৃতিকভাবে হয়েই ছিল। বাংলার সকল মিল-কলকারখানা এবং কলিকাতা শহর পশ্চিম বাংলার সীমানায় ছিল। স্বভাবতই বাংলা বিভক্ত হলে পশ্চিম বাংলার ক্ষতি ছিল না; বরং সেখানে হিন্দুদের পক্ষে চিরকাল প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্ভবপর। সুতরাং হিন্দু-নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভক্তির পক্ষে কথা বলেননি।

ঘ. সময়ের স্বল্পতাও একটি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে অখণ্ড বাংলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের ঘটনা ঘটে আগস্টে। সুতরাং দুই বা তিন মাসের মধ্যে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলেটের মতো বাংলা বিভক্তির প্রশ্নে গণভোট করা যেত। কিন্তু তারও সময় ছিল না।

ঙ. মুসলিম লীগ কিংবা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডে বাংলার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ফলে পশ্চিমা মুসলমান ও উত্তর ভারতের হিন্দু-নেতৃত্ব তাদের নিজ নিজ স্বার্থে বাংলা বিভাগের বিষয়টি বিবেচনা করেন। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা ভারতের হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্য মাথাব্যথার কারণ ছিল। কলিকাতা ছিল হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নাভীকেন্দ্র। গোটা বাংলা ও সারা ভারতের পুঁজি সংগঠক হিসেবে ঈঙ্গ-মার্কিন ও মাড়োয়ারী গোষ্ঠী বিরামহীন গতিতে কাজ করেছে তৎকালীন কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। সুতরাং বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে

Android Coding Bd

আত্মপ্রকাশ করলে ইঙ্গ-মার্কিন ও মাড়োয়ারী পুঁজি বাঙালিদের হাতে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই অবাঙালি দেশী-বিদেশী পুঁজি সংগঠকরা বুঝতে পারে এবং সে-কারণেই তারা বাংলাকে ভারতের দুই অংশের পরাধীন ভূমিতে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করে।

অপরপক্ষে মুসলিম লীগের পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ মুসলিম- অধ্যুষিত পূর্ববাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে শোষণ করার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে চেয়েছিলেন। তাদের এই অসৎ উদ্দেশ্যকে সহযোগিতা করেন পূর্ববাংলার খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এরা ভালো করেই জানতেন যে অবিভক্ত বাংলা হলে তাদের পক্ষে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপকে ডিঙিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই তারা কেবলমাত্র ক্ষমতার লোভেই খণ্ডিত বাংলাকে স্বাগত জানান।

১৯৪৭ সালের বাংলার সীমানা চিহ্নিতকরণ

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যকার সঠিক সীমানা নির্ধারণ করার জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সীমানা কমিশন গঠন

প্রাথমিক চিন্তায় বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য দুটি ভিন্ন কমিশন গঠনের এবং প্রতি কমিশনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচিত হয়। কিন্তু সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ সীমানা নির্ধারণে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৮ জুন ১৯৪৭ তারিখে মি. জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। জিন্নাহ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের সীমানা কমিশনের প্রতিটিতে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির তিনজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁরা বৃদ্ধ বয়সে ভারতবর্ষের গরম সহ্য করতে পারবেন না– এই অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন উক্ত প্রস্তাব নাকচ করলে জিন্নাহ বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রতি কমিশনে তিনজন করে অভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কমিশন গঠন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং যেহেতু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পূর্বেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে তাই জিন্নাহর দ্বিতীয় প্রস্তাবও নাকচ করা হয়।

১০ জুন ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এই বৈঠকে জিন্নাহর দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে তা নাকচ করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব করেন যে, প্রতি কমিশনে ২ জন মুসলিম লীগ ও ২ জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং উভয় কমিশনের জন্য

Android Coding Bd

একজন নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হোক। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করবে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ হবেন বিচার বিভাগীয়।

১২ জুন নেহেরু মিশনের 'টাইম অব রেফারেন্স' কী হওয়া উচিত তার খসড়া গভর্নর জেনারেলকে প্রদান করেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্ত খসড়ায় নেহেরুর প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ:

ক. বাংলার দুই অংশের সীমানা মুসলমান ও অমুসলমানগণ যে-সকল সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তা নির্ণয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সীমানা নির্ধারণ করার সময় অন্যান্য বিষয় (Other factors) ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

খ. সিলেটে গণভোটের ফলাফল যদি উক্ত জেলার পূর্ব বাংলার সংযুক্তির পক্ষে হয় তাহলে বাংলার সীমানা কমিশনই সিলেটের ও সিলেট সংলগ্ন জেলাসমূহের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করবেন।

২৩ জুন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার সময় জিন্নাহ এই টার্মস অব রেফারেন্সে সম্মতি দেন। বাংলা সীমানা কমিশন এই টার্মস অব রেফারেন্সের ভিত্তিতেই কাজ করে।

১৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা আহবান করেন। নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালিনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার ও বলদেব সিং উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে উভয় দল একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. প্রতি সীমানা কমিশন একজন নিরপেক্ষ সভাপতি এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

খ. সদস্যবৃন্দ বিচার বিভাগীয় হবেন।

গ. পাঞ্জাব কমিশনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বদের একজন শিখ প্রতিনিধি থাকবেন।

ঘ. জিন্নাহ ও নেহেরু স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিত্বদের নাম গভর্নর জেনারেলের নিকট জমা পদবেন।

ঙ. প্রতি সীমানা কমিশনের সদস্যবৃন্দ বৈঠকে বসে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নাম সুপারিশ করবেন। তারা এ-কাজে ব্যর্থ হলে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যৌথ বৈঠকে তা ঠিক করবেন।

চ. টার্মস অব রেফারেন্স সংক্রান্ত ইতিপূর্বে পেশকৃত নেহেরুর খসড়া রিপোর্টটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করে তাদের মতামত গভর্ণর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রসঙ্গে জিন্নাহসহ ২৩ জন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে একজন ব্রিটিশ বিচারক বাংলা ও পাঞ্জাব এই উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন এবং তিনি Arbitration Tribunal-এরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেতে পারেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে অবহিত করেন যে, Arbitration Tribunal-এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ভারত সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। জিন্নাহ এর পরদিন র‍্যাডক্লিফকেই বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণের জন্য মুসলিম

Android Coding Bd

লীগের সম্মতির কথা গভর্নর জেনারেলকে জানিয়ে [illegible] ২৭ জুন অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকলীন কেবিনেট সভার বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জিন্নাহর সুপারিশ অবহিত করেন। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ র‍্যাডক্লিফকে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে জিন্নাহ এবং নেহেরু কমিশনের স্বীয় দলের সদস্য-প্রতিনিধির নাম ভাইসরয়ের নিকট জমা দেন। বাংলা সীমানা কমিশনের মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন:

১. কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং
২. পাঞ্জাব হাইকোর্টের জাস্টিস এস. এ. রহমান।

কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন :

১. জাস্টিস সি. সি. বিশ্বাস এবং
২. জাস্টিস বিজন কুমার মুখার্জী। উভয়ই কলিকাতা হাইকোর্টের।

এই সময় আসামের গভর্নর সিলেটের পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সীমানা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু বাংলা সীমানা কমিশনই আসাম-সিলেট অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করবেন–ইতিপূর্বে গৃহীত কংগ্রেস-লীগের এই সিদ্ধান্তের আলোকে আসাম গভর্নরের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের সদস্যদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা কমিশন পূর্ববাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিত করবেন। ৪ জুলাই ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ঘোষণা করেন। স্যার র‍্যাডক্লিফ ৮ জুলাই দিল্লি পৌঁছেন এবং অনতিবিলম্বে ভাইসরয়, কমান্ডার ইন চিফ, এবং লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং এই ধারণা পান যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করতে হবে। ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় র‍্যাডক্লিফ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেন যে, সীমানা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে র‍্যাডক্লিফ আরো পাস করিয়ে নেন যে তার কোনো সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না এবং কমিশন যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে লীগ ও কংগ্রেস তা হুবহু মেনে নেবে। ফলত কমিশনের চেয়ারম্যান হন সর্বেসর্বা। প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

বাংলা সীমানা কমিশনের কার্যাবলি

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দিল্লিতে বসেই সীমানা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুধু একবার কলিকাতা ঘুরে যান। তিনি নিয়ম করেন যে, কমিশনের সদস্যগণ কলিকাতা ও লাহোর থেকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর নিকট দিল্লিতে প্রেরণ করবেন এবং তিনি সেখানে সেগুলো পর্যালোচনা করবেন। কলিকাতায় বাংলা কমিশনের পক্ষ থেকে আগ্রহী বিভিন্ন দলকে সীমানা সংক্রান্ত দাবিনামা পেশ করার

Android Coding Bd

আহবান জানান। জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা কমিশন ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার নেন। কংগ্রেস, বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ থেকে ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোট অনুযায়ী সিলেট জেলা পূর্ববাংলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কমিশন ৪ থেকে ৬ আগস্ট কলিকাতায় এক বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে আসাম সরকার ও পূর্ববাংলা সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ এবং পূর্ববাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে দাবিনামা পেশ করা হয় তাতে বাংলার মোট ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪০,১৩৭ বর্গমাইল দাবি করা হয়। দাবিকৃত এলাকার জনসংখ্যা ছিল অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৫%, তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩২% এবং বাকিরা অমুসলমান। কংগ্রেস যে সমস্ত এলাকার দাবি করে সেগুলো হচ্ছে গোটা বর্ধমান বিভাগ, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলাসমূহের সামান্য অংশ বাদে গোটা প্রেসিডেন্সি বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, রংপুর জেলা থেকে ডিমলা ও হাতিবান্ধা থানা, দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ এবং নবাবগঞ্জ মহকুমা বাদে মালদহ জেলা, ঢাকা বিভাগের বরিশাল জেলা থেকে গৌরনদী, নজীপুর, স্বরূপকাঠি এবং ঝালকাঠি থানাসমূহ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজৈর থানা। ভারত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে আসামের রেল-যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস রংপুর জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ভুরুঙ্গামারীও দাবি করে বসে। কংগ্রেস কলিকাতা শহর পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পেশ করে। তাদের দাবির স্বপক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, ১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী কলিকাতা শহরে মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ২৩.৫৯% (মোট ২,১০৮,৮৯১ এর মধ্যে ৪,৯৭,৫৩৫), কর প্রদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১৪.৮% (৬৮,৫৬৭ এর মধ্যে ১০,১৪৯) এবং কলিকাতা শহরের ৮১,১৫৯টি বাড়ির মধ্যে মুসলমান বাড়ির সংখ্যা মাত্র ৬,৮৬৩(৮.৪৫%)। কংগ্রেস আরো উল্লেখ করে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে মুসলমানদের দান মাত্র ১% (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের মধ্যে মাত্র ১ লাখ)। কংগ্রেস আরো যুক্তি দেখায় যে কলিকাতার আশেপাশে যে ১১৪টি পাটকল আছে তার সবগুলির মালিক অমুসলমান ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত করলে কলিকাতা পশ্চিমবাংলারই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কলিকাতা শহর ও এর অধিবাসীদের প্রয়োজনে (রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, নদী, সড়ক ও রেল যোগাযোগ নির্বিঘ্ন রাখতে, প্রভৃতি) মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, যশোর জেলাসমূহ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জেলাগুলিকে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অপরপক্ষে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ,

Android Coding Bd

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বেশিরভাগ অংশ এবং বর্ধমান জেলাভুক্ত হুগলি ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হয়। মুসলিম লীগের দাবিতে বলা হয় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এবং পূর্ববাংলার অর্থনীতির প্রয়োজনে এই জেলাগুলি পূর্ববাংলাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, উত্তর বাংলার অর্থনীতিতে তিস্তা নদী ও এর শাখানদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ নদীগুলি জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। তাছাড়া পূর্ববাংলার রেলপথ সংরক্ষণের একমাত্র উৎস হচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ অবস্থিত পাহাড়ের পাথর। পূর্ববাংলার কাঠের চাহিদা মেটানো হত জলপাইগুড়ি জেলার বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ থেকে। সুতরাং মুসলিম লীগ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগ কলিকাতা শহর পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি পেশ করে। মুসলিম লীগ যুক্তি পেশ করে যে, কলিকাতা শহরটি গড়ে উঠেছে মূলত পূর্ববাংলার সম্পদ দিয়ে। পৃথিবীর ৮০% পাট পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হয় এবং ঐ পাট দিয়েই কলিকাতার আশেপাশের পাটকল চলে। তাছাড়া কলিকাতা ছিল বাংলার একমাত্র সমুদ্র বন্দর। উক্ত বন্দরে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী নাবিকরা মূলত পূর্ববাংলার লোক। অতএব কলিকাতা পূর্ববাংলারই প্রাপ্য।

এইভাবে কংগ্রেস ও লীগের দাবিদাওয়ার মীমাংসা করা সীমানা কমিশনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ব্যক্তিগতভাবে এই সকল দাবিদাওয়া বিষয়ে কোনো পক্ষকে সাক্ষাৎকার দেননি। তিনি বুঝতে পারেন যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমতো সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। সীমানা চিহ্নিত সংক্রান্ত তিনি কতগুলি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভাবন করেন যেমন:

ক. বাংলার কোন অংশকে কলিকাতা শহর প্রদান করা উচিত? এই শহরকে দ্বিখণ্ডিত করে উভয় অংশকে খুশি করা কি সম্ভব?

খ. সমগ্র কলিকাতা কোনো একটি অংশকে প্রদান করার পিছনে নদীয়া কিংবা কুলাট নদী ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না।

গ. টার্মস অব রেফারেন্সে উল্লেখিত 'সম্প্রদায়গত সংলগ্ন এলাকার' নীতিকে উপেক্ষা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা যশোর ও নদীয়া পশ্চিম বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থ হবে কি না।

ঘ. মালদহ ও দিনাজপুর জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কিছু অংশ হিন্দু

Android Coding Bd

সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা কি পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

ঙ. দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু জেলাদ্বয়ের মুসলমান জনসংখ্যা অত্যন্ত কম (১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী দার্জিলিং-এ মাত্র ২.৪২% ও জলপাইগুড়িতে ২৩.০৮%।) সুতরাং এই জেলাদ্বয় কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত?

চ. পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান জনসংখ্যা মাত্র ৩% হলেও জেলাটি চট্টগ্রাম জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই জেলাটি কোন ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে?

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও 'সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এলাকার সংলগ্নতা' (Majority and Contiguity Principles)-এর ভিত্তিতে সীমান চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস-সীমানা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস এর সমঝোতা নীতিকে উপেক্ষা করে নিজের বিচারবুদ্ধিমতো সীমানা চিহ্নিত করেন। জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সীমানা নির্ধারণ করলে অন্তত কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তার দিল্লির অফিসে বসে টেবিলের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র রেখে মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের সীমানা চূড়ান্ত করেন। এই কাজ করতে তিনি মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৫ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে কলিকাতার এক জনসভায় উল্লেখ করেন যে, 'আমরা ভারত বিভাগে রাজি হওয়ার পূর্বশর্তস্বরূপ কলিকাতা শহর যেন ভারতভুক্ত থাকে তার নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম। আমাদেরকে সে নিশ্চয়তা দেয়া হলে আমরা ভারত বিভক্তিতে সম্মত হই। মাউন্টব্যাটেন যেভাবেই হোক কলিকাতা ভারতকে দেবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই তিনি সীমানা কমিশনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য কিংবা জাতিসংঘের মনোনীত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন করেননি।

যাহোক, র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় কলিকাতা পশ্চিমবাংলাভুক্ত করা হয়। নদীয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬১% মুসলমান) জেলা হওয়া সত্ত্বেও এর ২/৩ অংশ এলাকা পশ্চিম বাংলাকে দেন। সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ (৫৬.৬% মুসলমান) পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। মালদহ (৫৭% মুসলমান) থেকে কেবল নবাবগঞ্জ মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়, বাকি অংশ (মালদহের প্রায় ২/৩ অংশ) পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। দিনাজপুরকে দুই অংশে বিভক্ত করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সৃষ্টি করে তা পশ্চিম বাংলাভুক্ত করা হয়। যশোর জেলার বনগাঁও (৫৩% মুসলমান) ও গৌহাটা পশ্চিম বাংলাভুক্ত হয়। খুলনা (৪৯.৩৬% মুসলমান) পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ও দুটি অমুসলমান গরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলাভুক্ত করা হয়। মুসলমান অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা ভারতকে প্রদানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রহণের ব্যাপারে

কংগ্রেসের ততটা আগ্রহ ছিল না।

Android Coding Bd

আসামের সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত টার্মস অব রেফারেন্সের বিষয়ে সীমানা কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মুসলমান সদস্যরা দাবি করেন যে, পূর্ববাংলার সংলগ্ন আসামের সকল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে হিন্দু-সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের ক্ষমতা কেবল সিলেট জেলা সংলগ্ন আসামের সীমানা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কমিশনের চেয়ারম্যান হিন্দু-সদস্যদের মত সমর্থন করেন।

সিলেট জেলার ৩৫টি থানার মধ্যে মাত্র ৮টি থানায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তার মধ্যে ২টি থানা শল্লা ও আজমিরীগঞ্জ-চারদিকে মুসলমান থানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি ৬টি থানা সিলেটের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটানা অবস্থিত ছিল-তবে মূল সিলেটের সঙ্গে থানাগুলির কোনো সংযোগ ছিল না। অপরদিকে কাছার জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা সিলেটের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বদরপুর ও করিমগঞ্জের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এই এলাকা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের দক্ষিণের ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার সঙ্গে আসামের কোনো সংযোগ থাকে না, আবার ৬টি থানাই আসামের অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের সঙ্গে পূর্ববাংলার রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কমিশনের চেয়ারম্যান মনে করেন যে, কিছু মুসলমান এলাকা ও হাইলকান্দি মহকুমা অবশ্যই আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং দক্ষিণ সিলেটের ও করিমগঞ্জ মহকুমার ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করে তার বিনিময়ে পাথরকান্দি, বাটাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর–এই চারটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও ১৫ আগস্টের পূর্বেই সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের কোনো কর্মসূচি যাতে সীমানা সংক্রান্ত ক্ষোভের কারণে ব্যাহত না হয় সেজন্য মাউন্টব্যাটেন তা ১৬ আগস্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। যথারীতি ১৬ আগস্ট বিকেল ৫ টায় ভাইসরয়ের বাড়িতে পার্টিশন কাউন্সিলের সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় পাকিস্তানের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে লিয়াকত আলী খান ও পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু এবং সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরদার বলদেব সিংহ, আবদুর রব নিশতার, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ভি.পি. মেনন উপস্থিত হন। সভার শুরুর তিন ঘণ্টা পূর্বে সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই রিপোর্ট কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিদের কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুই ঘন্টা ধরে সভায় হট্টগোল এবং বাদ-প্রতিবাদ চলে। তবে শেষপর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন যে, যেহেতু সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে কেউই খুশি হতে পারেননি, তার অর্থ প্রত্যেক পক্ষ কোথাও-না কোথাও কিছু সুবিধা লাভ করেছে যা অন্য পক্ষকে অসন্তুষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হয় এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার ঐক্যমত ঘোষণা করে।

বাংলা সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার

Android Coding Bd

Android Coding Bd

মোট আয়তনের ৬৩.৮০% এবং মোট জনসংখ্যার ৬৮.৬৬% নিয়ে কাজ। বৃহত্তর বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩.৯৪% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ৭০.৮৩: ২৯.১৭। নবগঠিত পশ্চিম বাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৫.০১%: ৭৪.৯৯%।

বাংলার সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মুসলমানদেরকে অবাক ও বিস্মিত করে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকার মুসলমান ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করে, অথচ পরবর্তীতে তারা জানতে পারে যে, তারা ভারতভুক্ত হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত না করে দিল্লির অফিসকক্ষে বসে মানচিত্রের উপর সীমানা চিহ্নিত করায় সীমানা কোনো ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করে, কোথাও তা বাড়ির আঙিনার মাঝখান দিয়ে যায়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো ঘরের দরজা পড়েছে পাকিস্তানে, তো জানালা পড়েছে ভারতে। সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাময়িক ক্ষোভ সৃষ্টি করলেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ চাপা পড়ে যায় দেশত্যাগ, দাঙ্গা ও লুটপাটের ঘটনার যাঁতাকলে।

সহায়ক গ্রন্থ

Nicholas Mansergh (editor-in-chief), *The Transfer of Power*, 19427. Vol. XI, The Mountbatten Viceroyalty London: 1981.

G.W. *Choudhury, Constitutional Development in Pakistan*. London: 1969

Harun-or-Rashid. *The Foreshadowing of Bangladesh*, Dhaka, 1987.

Latif Ahmed Sherwani (ed), *Pakistan Resolution To Pakistan, 1940-1947. A Selection of Documents Presenting the Case for Pakistan*, Karachi. 1969.

অমলেন্দু দে, *স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি*, কলিকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫

হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০০৩

Android Coding Bd